।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথ তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, এই বুদ্ধি তোমার জন্য জ্ঞানমার্গের বিষয়ে বলা হয়েছে। সেই বুদ্ধি কি? এই যে যুদ্ধ কর। এই যুদ্ধে বিজয়ী হলে মহামহিম স্থিতি এবং পরাজয় হলে দেবত্বলাভ হবে। জয়লাভ করলে সর্বস্ব এবং পরাভব হলে দেবত্ব, কিছু লাভ হবেই। অতএব এই দৃষ্টিতে লাভ-লোকসান দুটিতেই কিছু না কিছু লাভ হবে। কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষতি নেই। পুনরায় বললেন– এখন তুমি নিষ্কাম কর্মযোগের বিষয়ে শোন, যে বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তুমি কর্মবন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যাবে। পুনরায় এই কর্মের বিশেষত্বের উপর আলোকপাত করলেন। কর্ম করবার সময় সাবধান হতে বললেন এবং ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে বললেন। কামনাশূন্য হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হতে বললেন, বললেন কর্ম করবার সময় অশ্রদ্ধাও যেন না হয়, তাহলেই তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবে। মুক্ত হবে ঠিকই কিন্তু সে বিষয়ে তোমার অবস্থান সম্বন্ধে তোমার অবহিত থাকার কথা নয়।

অতএব অর্জুনের নিষ্কাম কর্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানমার্গই সহজ বলে বোধ হ'ল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন– হে জনার্দন! নিষ্কাম কর্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানমার্গই যদি আপনার বিচারে শ্রেষ্ঠ, তবে কেন আমাকে এই ভয়ঙ্কর কর্মে নিযুক্ত করছেন? এই জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক ছিল। মনে করুন আপনার সম্মুখে দুটি পথ আছে, দুটিই একই স্থানে নিয়ে যায়। এখন আপনি যদি যেতে চান, তাহলে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করবেন উভয়ের মধ্যে সুগম কোনটি? যদি না করেন তাহলে আপনি পথিক নন। ঠিক এইভাবে অর্জুনও জিজ্ঞাসা করলেন–

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎকর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব।।১।।

জনগণের প্রতি দয়ালু, জনার্দন! যদি নিষ্কাম কর্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ বলে আপনার অভিমত, তাহলে হে কেশব! আমাকে ভয়ঙ্কর কর্মযোগে কেন নিযুক্ত করছেন?

নিষ্কাম কর্মযোগ অর্জুনের ভয়ঙ্কর বলে মনে হ'ল; কারণ এতে কর্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে নয়। কর্ম করবার সময় অশ্রদ্ধাও যেন না হয় এবং নিরন্তর সমর্পণের মধ্য দিয়ে যোগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কর্মে প্রবৃত্ত হও। জ্ঞানমার্গে পরাজয় হলে দেবত্ব, জয়লাভ করলে মহামহিমস্থিতি লাভ হবে। লাভ-লোকসান স্বয়ং নির্ণয় করে এগিয়ে যেতে হবে। অর্জুনের নিষ্কাম কর্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগ সহজ বলে বোধ হ'ল। সেইজন্য তিনি নিবেদন করলেন—

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্।।২।।

আপনি এই মিশ্রিত বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধি যেন মুগ্ধ করছেন। আপনি আমার বুদ্ধির মোহ দূর করবার জন্য প্রবৃত্ত হয়েছেন। অতএব উভয়ের একটি আমাকে নিশ্চয় করে বলুন, যার দ্বারা আমি **'শ্রেয়'**- পরমকল্যাণ, মোক্ষলাভ করতে পারি। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বললেন-

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেহস্মিন্দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্।।৩।।

হে নিষ্পাপ অর্জুন! এই লোকে সত্যানুসন্ধানের দুটি ধারার কথা পূর্বে আমার দ্বারা বলা হয়েছে। পূর্বের অর্থ সত্যযুগ অথবা ত্রেতাযুগ নয়, বরং যা দ্বিতীয় অধ্যায়েই বলে এসেছি। জ্ঞানীগণের জন্য জ্ঞানমার্গ ও যোগীগণের জন্য নিষ্কাম কর্মযোগ বলা হয়েছে। উভয় মার্গ অনুসারেই কর্ম করতে হবে। কর্ম অনিবার্য।

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।।৪।।

অর্জুন! কর্ম আরম্ভ না করে কেউ নৈষ্কর্ম্য লাভ করতে পারে না এবং যে ক্রিয়া আরম্ভ করা হয়েছে, তা পরিত্যাগ করলেই ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ পরমসিদ্ধি লাভ

হয় না। এখন তোমার জ্ঞানমার্গ ভাল লাগে অথবা নিষ্কাম কর্মমার্গ, উভয় মার্গেই কর্ম করতে হবে।

প্রায়ই এই ক্ষেত্রে, ভগবৎপথে লোকে সহজপথ এবং সুরক্ষা খুঁজতে আরম্ভ করে। "কর্মানুষ্ঠান না করেই, নিষ্কর্মী হওয়া যায়"- যেন এই ধরণের ভুল না হয়, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ জোর দিলেন যে, কর্ম আরম্ভ না করে কেউ নৈষ্কর্ম্য লাভ করতে পারে না। শুভাশুভ কর্মের শেষ যেখানে, পরম নৈষ্কর্ম্যের সেই স্থিতি কর্ম করেই লাভ করা যায়। সেইরূপ বহু লোকে বলে যে, "আমরা জ্ঞানমার্গী, জ্ঞানমার্গে কর্ম নেই।"- এরূপ বললেই কর্মত্যাগী জ্ঞানী হয় না। যে ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে, তা ত্যাগ করলেই কেউ ভগবৎসাক্ষাৎকাররূপ পরমসিদ্ধি লাভ করে না। কারণ–

ন হি কশ্চিৎক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।

কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।৫।।

কর্ম না করে কোন পুরুষ ক্ষণমাত্রও থাকতে পারে না, কারণ সকলেই প্রকৃতিজাত গুণত্রয়দ্বারা মোহমুগ্ধ হয়ে কর্ম করে। প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত গুণ যতক্ষণ পর্যন্ত সক্রিয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন পুরুষ কর্ম না করে থাকতে পারে না।

চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৩ ও ৩৭ তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—সকলকর্ম জ্ঞানে শেষ হয়। জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম ভস্মসাৎ করে। এখানে বলছেন কর্ম না করে কেউ থাকতে পারে না। তিনি কি বলতে চাইছেন ? তাঁর বলবার অর্থ হল যে, যজ্ঞ করতে করতে ত্রিগুণাতীত হলে মনের বিলয় এবং সাক্ষাৎকারের সঙ্গে যজ্ঞের পরিণাম লাভ হলে কর্ম শেষ হয়ে যায়। সেই নির্ধারিত ক্রিয়া পূর্ণ হওয়ার আগে কর্ম সম্পূর্ণ হয় না, প্রকৃতির হাত থেকে রেহাই পাওযা যায় না।

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।

ইন্দ্রিয়ার্থান্বিমূঢাত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।।৬।।

তা' সত্ত্বেও কিছু মূঢ়ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়গুলি বলপূর্বক রুদ্ধ করে মনে মনে ইন্দ্রিয়ের ভোগসমূহ স্মরণ করে, তাদের মিথ্যাচারী, দাম্ভিক বলে। জ্ঞানী বলে না। এ কথা প্রমাণিত যে, কৃষ্ণকালেও এই ধরণের সংস্কার ছিল। লোকে যা' করণীয় তা ত্যাগ করে ইন্দ্রিয়গুলি বলপূর্বক রুদ্ধ করে বলে বেড়াত যে আমি জ্ঞানী, আমি পূর্ণ।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, তারা সকলেই ধূর্ত। জ্ঞানমার্গ ভাল লাগুক অথবা নিষ্কাম কর্মযোগ, উভয় মার্গেই কর্ম করতে হবে।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন।

কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে।।৭।।

অর্জুন! যিনি মন থেকে ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করেন, যখন মনেও বাসনার স্ফুরণ হয় না, সর্বদা অনাসক্ত হয়ে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্মযোগের আচরণ করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ। একথা বোঝা গেল যে, কর্মের আচরণ করতে হবে; কিন্তু প্রশ্ন যে কোন্ কর্ম করব? এই প্রসঙ্গে—

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ।।৮।।

অর্জুন! তুমি নির্ধারিত কর্ম কর। অর্থাৎ কর্মের সংখ্যা অনেক, তার মধ্যে নির্দিষ্ট যে কর্মটি, সেই নিয়ত কর্ম কর। কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ। কারণ কর্ম করে, অল্প দূরত্বও অতিক্রম করে থাকলে, যেমন পূর্বে বলেছেন যে, জন্ম-মৃত্যুর মহাভয় থেকে উদ্ধার করে, সেইজন্য শ্রেষ্ঠ। কর্ম না করলে তোমার দেহ-যাত্রাও নির্বাহ হবে না। দেহ-যাত্রার অর্থ লোকে বলে– 'শরীর-নির্বাহ'। কিরূপ শরীর-নির্বাহ? আপনি কি দেহ? এই পুরুষ জন্ম-জন্মান্তর, যুগ-যুগান্তর ধরে দেহ-যাত্রাই তো করে আসছে। বস্ত্র জীর্ণ হলেই, অন্য বস্ত্র ধারণ করে। সেইরূপ কীট-পতঙ্গ থেকে শুরু করে মানুষপর্যন্ত, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে গোটা জগৎ পরিবর্তনশীল। উত্তম-অধম বিভিন্ন যোনিতে এই জীব নিরন্তর দেহ-যাত্রাই করে চলেছে। কর্মই এই দেহ-যাত্রা সম্পূর্ণ করে। মনে করুন একটা মাত্র জন্ম নিতে হয়েছে, তবু যাত্রা তো সম্পূর্ণ হয়নি, এখনও সে পথিক। যাত্রা সম্পূর্ণ তখনই হবে, যখন গন্তব্য এসে যাবে। পরমাত্মাতে স্থিতি লাভ করবার পর আত্মাকে শরীরে অনুপ্রবেশ করে আর যাত্রা করতে হয় না। অর্থাৎ শরীর-ত্যাগ এবং শরীর-ধারণ এই পর্যায়ে শেষ হয়। অতএব কর্ম পূর্ণতা প্রদান করে, এই পুরুষকে কর্ম সম্পূর্ণ হওয়ার পর আর দেহের যাত্রা করতে হয় না। **'মোক্ষ্যসেহশুভাৎ' (৪/১৬)**- অর্জুন! এই কর্ম করে তুমি সংসার-বন্ধন স্বরূপ 'অশুভ' থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কর্ম সংসার-বন্ধনথেকে মুক্ত করে দেয়। এখন প্রশ্ন সেই নির্ধারিত কর্ম কি? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

যজ্ঞার্থাৎকর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।।৯।।

অর্জুন! যজ্ঞের অনুষ্ঠানই কর্ম। যে ক্রিয়াদ্বারা যজ্ঞ পূর্ণ হয়, সেই ক্রিয়া কর্ম। প্রমাণিত হল যে কর্ম একটি নির্ধারিত প্রক্রিয়া। এছাড়া অন্য কর্ম কি কর্ম নয়? শ্রীকৃষ্ণ বললেন— না, সে সব কর্ম নয়। '**অন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ**'- এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান ছাড়া জগতে যা কিছু করা হয়, যাতে সারা জগৎ রাত-দিন ব্যস্ত, সে সমস্ত এই লোকেরই বন্ধন, কর্ম নয়। কর্ম '**মোক্ষ্যসেহশুভাৎ**'- অশুভ অর্থাৎ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদান করে। একমাত্র কর্ম হল—যজ্ঞের প্রক্রিয়া। অতএব অর্জুন! সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করার জন্য সঙ্গদোষ থেকে পৃথক্ অবস্থান করে, উত্তমরূপে কর্মের আচরণ কর। সঙ্গদোষ থেকে পৃথক্ না হলে এই কর্ম সম্পূর্ণ হয় না।

এখন স্পষ্ট হল যে, 'যজ্ঞের অনুষ্ঠানকেই কর্ম' বলে; কিন্তু এখানে পুনরায় এক নূতন প্রশ্নের উদয় হল যে, সেই যজ্ঞ কি, যার অনুষ্ঠান করা হবে? সেইজন্য প্রথমে যজ্ঞ কি তা' না বলে শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে যজ্ঞের উৎপত্তি হ'ল কোত্থেকে? যজ্ঞ থেকে আমরা কি ফললাভ করি? তার বিশেষত্ব বললেন এবং চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্ট করেছেন যে যজ্ঞ কি, যার অনুষ্ঠান করলে কর্মের আরম্ভ হবে। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাণীর নিপুণতাতে স্পষ্ট হয় যে, যে বিষয়ের বর্ণনা করবেন, প্রথমে তিনি তার বিশেষত্বের বর্ণনা করলেন, যাতে শ্রদ্ধা জাগে। তার পর তিনি তাতে যে সতর্কতা অবলম্বন করা হয় তার উপর আলোকপাত করলেন এবং অবশেষে মুখ্য সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করলেন।

এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক শ্রীকৃষ্ণ কর্মের অন্যান্য অঙ্গের উপর আলোকপাত করেছেন যে, কর্ম হল নির্ধারিত ক্রিয়া। নির্ধারিত ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কর্ম, কর্ম নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমবার কর্মের নাম উল্লেখ করেছেন, তার বিশেষত্বের উপর জোর দিলেন, তাতে যে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, তার উপর আলোকপাত করলেন; কিন্তু কর্ম কি? বললেন না। এখানে বর্তমান অধ্যায়ে বললেন যে, কেউ কর্ম না করে থাকতে পারে না। প্রকৃতির প্রভাবে মানুষ কর্ম করে। এছাড়া যারা ইন্দ্রিয়গুলিকে বলপূর্বক অবরুদ্ধ করে মন থেকে বিষয়-চিন্তন করে, তারা ছলগ্রাহী। সেইজন্য অর্জুন! মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করে তুমি কর্ম কর। কিন্তু কোন্

কর্ম করা হবে, সে প্রশ্নটি যেমনের তেমনি রইল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন– অর্জুন! তুমি নির্ধারিত কর্ম কর।

এখন প্রশ্ন যে, সেই নির্ধারিত কর্ম কি, যার অনুষ্ঠান করতে বলেছেন? তিনি বলছেন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই কর্ম। এখন প্রশ্ন ওঠে যে যজ্ঞ কি? এখানে যজ্ঞের উৎপত্তি এবং বিশেষত্ব পর্যন্ত বলবেন। চতুর্থ অধ্যায়ে যজ্ঞের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হবে, যার অনুষ্ঠানই কর্ম।

গীতাশাস্ত্র বোঝার চাবিকাঠি হ'ল, কর্মের এই পরিভাষা। যজ্ঞ ছাড়া সবকিছু করে সংসারী লোকেরা। কেউ চাষ করে, কেউ ব্যবসা। কেউ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত, কেউ সেবক। কেউ বা নিজেকে বুদ্ধিজীবী বলে, কেউ বলে শ্রমিক। কেউ সমাজসেবাকে, কেউ দেশসেবাকে কর্ম বলে মনে করে। এই কর্মগুলির মধ্যে কিছু কর্মকে সকাম এবং কিছু কর্মকে নিষ্কাম কর্ম বলে লোকে এর ভূমিকাও তৈরী করে নিয়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে, সেসব কর্ম নয়। **'অন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ'**–যজ্ঞের অনুষ্ঠান ছাড়া যা কিছু করা হয়, সেসব কর্ম এই লোকেরই বন্ধন, মোক্ষ প্রদানকারী কর্ম নয়। বস্তুতঃ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্ম। এখন যজ্ঞ কি, তা না বলে আগে যজ্ঞ এলো কোত্থেকে? তা বলছেন–

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্ত্বিষ্টকামধুক্‌।।১০।।

প্রজাপতি ব্রহ্মা কল্পারম্ভে যজ্ঞের সহিত প্রজাসৃষ্টি করে বলেছিলেন যে, এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। এই যজ্ঞ তোমাদের **'ইষ্টকামধুক্‌'**- যাতে অনিষ্ট না হয়, অবিনাশী ইষ্ট-সম্বন্ধী কামনা পূর্ণ করুক।

যজ্ঞসহিত প্রজাদের কে সৃষ্টি করেছিলেন? প্রজাপতি ব্রহ্মা। ব্রহ্মা কে? তিনি কি চতুর্মুখ এবং অষ্টচক্ষুবিশিষ্ট কোন দেবতা, যেমন প্রচলিত আছে? না, শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে দেবতা নামের কোন আলাদা সত্তা নেই। তাহলে প্রজাপতি কে? বস্তুতঃ যিনি প্রজার মূল উদ্‌গম, পরমত্মাতে স্থিতি লাভ করেছেন, সেই মহাপুরুষই প্রজাপতি। বুদ্ধিই 'ব্রহ্মা'। **'অহংকার সিব বুদ্ধি অজ, মন সসি চিত্ত মহান।' (রামচরিতমানস, ৬/১৫ ক)** সেই সময় বুদ্ধি যন্ত্রমাত্র হয়। এইরূপ মহাপুরুষের মাধ্যমে পরমাত্মাই কথা বলেন।

ভজনের বাস্তবিক ক্রিয়া আরম্ভ হ'লে, বুদ্ধির ক্রমবিকাশ হয়। শুরুতে সেই বুদ্ধি ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য তাকে 'ব্রহ্মবিৎ' বলা হয়। ক্রমশঃ সমস্ত বিকার শান্ত হলে, ব্রহ্মবিদ্যাতে শ্রেষ্ঠতা-লাভ করলে তাকে 'ব্রহ্মবিদ্বর' বলা হয়। ধীরে ধীরে বিকাশ আরও সূক্ষ্ম হলে বুদ্ধির আরও বিকাশ হয়, তখন তাকে 'ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্' বলে। সেই অবস্থা-লাভ হলে ব্রহ্মবিদ্বেত্তা পুরুষ অন্যকেও উত্থান মার্গে নিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা হ'ল 'ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ' অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ-এর সেই অবস্থা, যাতে ইষ্ট ওতপ্রোত। এইরূপ স্থিতিলাভ করেছেন যিনি, তিনি প্রজার মূল উদ্‌গম পরমাত্মায় স্থিত থাকেন। এরূপ মহাপুরুষের বুদ্ধি যন্ত্রমাত্র। তাঁদেরই প্রজাপতি বলা হয়। তাঁরা প্রকৃতির দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ করে আরাধনা ক্রিয়ার রচনা করেন। যজ্ঞের অনুরূপ সংস্কার প্রদান করাই প্রজাসৃষ্টি। এর পূর্বে সমাজ অচৈতন্য এবং অব্যবস্থিত অবস্থাতে থাকে। যজ্ঞের অনুরূপ এদের গড়ে তোলাই হ'ল সৃষ্টি অর্থাৎ সুসজ্জিত করা।

এইরূপ মহাপুরুষ সৃষ্টির আরম্ভে যজ্ঞসহিত প্রজার সৃষ্টি করেছেন। কল্প রোগমুক্ত করে। বৈদ্য কল্প প্রদান করেন, আবার কেউ কায়াকল্প করে। এটা ক্ষণিক শরীরের কল্প। যথার্থ কল্প তখনই হয়, যখন ভবরোগ থেকে মুক্তিলাভ হয়। আরাধনার আরম্ভ, এই কল্পের প্রারম্ভিক অবস্থা। আরাধনা সম্পূর্ণ হলেই, কল্প সম্পূর্ণ হবে।

সেইরূপ পরমাত্মস্বরূপে স্থিত মহাপুরুষগণ ভজনের আরম্ভে যজ্ঞসহিত সংস্কার সুসংগঠিত করে বললেন যে, এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা সমৃদ্ধ হও। কিরূপ সমৃদ্ধি? সেই সমৃদ্ধি কি কাঁচা ঘর-বাড়ী পাকা করা, বেশী উপার্জন করা? বলছেন– না, যজ্ঞ **'ইষ্টকামধুক্'**- ইষ্ট-সম্বন্ধী কামনা পূর্ণ করবে। ইষ্ট একমাত্র পরমাত্মা। সেই পরমাত্মা সম্বন্ধী কামনা পূর্ণ করে এই যজ্ঞ। এখানে প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, যজ্ঞ সরাসরি পরমাত্মার প্রাপ্তি করাবে অথবা ক্রমে ক্রমে চলার পর?–

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।।১১।।

এই যজ্ঞদ্বারা দেবতাগণের উন্নতি কর অর্থাৎ দৈবী সম্পদের বৃদ্ধি কর। সেই দেবতাগণও তোমাদের উন্নত করবেন। এইরূপ পরস্পরের উন্নতিদ্বারা পরমশ্রেয়, যারপর কিছু লাভ করা বাকী থাকবে না, এইরূপ পরমকল্যাণ লাভ করবে। যেমন যেমন আমরা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করব (পরে যজ্ঞের অর্থ আরাধনার বিধি হবে) তেমন

তেমন হৃদয়ে দৈবী সম্পদ্ অর্জন হতে থাকবে। পরমদেব একমাত্র পরমাত্মা। সেই পরমদেব-এ স্থিতি লাভ করতে সাহায্য করে যে সম্পদ্ অন্তঃকরণে যে সজাতীয় প্রবৃত্তি বিদ্যমান, সেই সজাতীয় প্রবৃত্তিসমূহই দৈবী সম্পদ্। এদের সাহায্যেই পরমদেব-এর প্রাপ্তি হয়, সেইজন্য দৈবী সম্পদ্ বলা হয়। বাহ্য জগতের দেবতা-পাথর-জল নয়, যেমন লোকে কল্পনা করে। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে তাদের অস্তিত্ব নেই। আরও বলছেন—

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।

তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।।১২।।

যজ্ঞদ্বারা সংবর্ধিত দেবতাগণ (দৈবী সম্পদ্) আপনাকে **'ইষ্টান্ ভোগান্ হি দাস্যন্তে'**- ইষ্ট অর্থাৎ আরাধ্য-সম্বন্ধী ভোগ প্রদান করবেন, অন্য কিছু নয়। **'তৈঃ দত্তান'**- তিনিই একমাত্র দাতা। ইষ্টলাভের অন্য কোন বিকল্প নেই। এই দৈবী গুণসমূহকে সংবর্ধন না করে, যিনি এই স্থিতি ভোগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই চোর। যখন লাভ হয় নি, তখন তিনি কি উপভোগ করবেন? কিন্তু বলেন অবশ্যই, আমি পূর্ণ, তত্ত্বদর্শী। এইরূপ মিথ্যাবাদী এই পথ থেকে মুখ লুকিয়ে বেড়ায়। তারা চোর, প্রাপ্তকর্ত্তা নয়। কিন্তু যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁরা কি পেয়েছেন?–

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।

ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।।১৩।।

যে সাধুপুরুষগণ যজ্ঞাবশেষ অন্ন গ্রহণ করেন, তাঁরা সকল পাপ থেকে মুক্ত হন। দৈবী সম্পদের বৃদ্ধি করতে করতে পরিণামে প্রাপ্তিকালই পূর্তিকাল। যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় যখন, তখন অবশিষ্ট যিনি থাকেন, তিনি হলেন ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই আবার অন্ন। একেই শ্রীকৃষ্ণ অন্যভাবে বললেন যে- **'যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্**।'- যজ্ঞ যার সৃষ্টি করে, সেই অশন যিনি গ্রহণ করেন, তিনি ব্রহ্মে লীন হন। এখানে তিনি বলছেন যে, যজ্ঞাবশেষ অশন (ব্রহ্ম-পীযুষ) যিনি পান করেন, তিনি সকল পাপ থেকে মুক্ত হন। সাধু ব্যক্তি মুক্ত হন; কিন্তু পাপী যারা, তারা মোহজাত দেহের পোষণের জন্যই অন্নপাক করে, পাপান্ন গ্রহণ করে। তারা ভজন করে আরাধনা বুঝে অগ্রসরও হয়, কিন্তু পরিবর্তে কিছু কামনা করে যে, **'আত্মকারণাৎ'**– দেহের

এবং এই দেহের সম্বন্ধীদের কিছু লাভ হোক। তারা নিশ্চয় লাভ করবে; কিন্তু তা ভোগ করবার পর নিজেকে তারা সেখানেই দেখতে পাবে, যেখান থেকে ভজনা আরম্ভ করেছিল। এর থেকে বেশী ক্ষতি কি হতে পারে? যখন এই দেহটাই নশ্বর, তখন এর সুখ-ভোগ কতদিন? তারা আরাধনা করে, কিন্তু পরিবর্তে পাপ গ্রহণ করে। '**পলটি সুধা তে সঠ বিষ লেহী।**' তা নষ্ট হবে না ঠিক কিন্তু এগিয়েও যাবে না। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম হয়ে কর্ম (ভজন) করবার উপর জোর দিলেন। এখন পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, যজ্ঞ পরমশ্রেয় প্রদান করে এবং মহাপুরুষই তার রচনা করেন। কিন্তু মহাপুরুষ প্রজা রচনার জন্য কেন প্রবৃত্ত হন? এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।

যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ।।১৪।।

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।

তস্মাৎসর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।।১৫।।

অন্ন থেকে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়। "**অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ**" **(তৈ. উপ. ২/১)**- পরমাত্মাই অন্ন। সেই ব্রহ্ম-পীযুষকেই উদ্দেশ্য করে প্রাণীগণ যজ্ঞের দিকে অগ্রসর হয়। বৃষ্টি থেকে অন্নের উৎপত্তি হয়। মেঘ থেকে যে বৃষ্টি হয় তা নয়, বরং কৃপাবৃষ্টি। পূর্বসঞ্চিত যজ্ঞ কর্মেরই কৃপারূপে বর্ষণ হবে। আজকের আরাধনা কাল কৃপারূপে লাভ হবে। সেইজন্য যজ্ঞদ্বারা বৃষ্টি হয়। স্বাহা উচ্চারণ এবং তিল-যবের আহুতি মাত্র দিলেই যদি বর্ষা হত, তাহলে বিশ্বের অধিকাংশ মরুভূমি অনুর্বর কেন রয়েছে? উর্বর হয়ে থাকত। এখানে যজ্ঞের পরিণাম কৃপাবৃষ্টি। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্মদ্বারা হয়, কর্ম করে গেলেই একদিন যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়।

সেই কর্ম বেদ থেকে উৎপন্ন জানবে। বেদ হ'ল ব্রহ্মস্থিত মহাপুরুষের বাণী। যে তত্ত্ব অবিদিত, তার প্রত্যক্ষ অনুভূতির নাম বেদ, কিছু শ্লোক-সংগ্রহ নয়। বেদ অবিনাশী পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে জানবে। বলেছেন মহাত্মাগণ, কিন্তু তাঁরা এবং পরমাত্মা ভিন্ন নন। তাঁদের মাধ্যমে অবিনাশী পরমাত্মাই কথা বলেন, সেইজন্য বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়। মহাপুরুষগণ বেদ পেলেন কোত্থেকে? অবিনাশী পরমাত্মা থেকে বেদের জন্ম হয়েছে। সেই মহাপুরুষগণ এবং তিনি অভিন্ন, তাঁরা যন্ত্রমাত্র, সেইজন্য তাঁদের মাধ্যমে পরমাত্মাই কথা বলেন। কারণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করে যখন মন নিরুদ্ধ হয়, তখনই পরমাত্মাকে জানা যায়। সেইজন্য সর্বব্যাপী পরম অক্ষর পরমাত্মা সর্বদা যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত। যজ্ঞের অনুষ্ঠানই তাঁকে লাভ করবার একমাত্র উপায়। এরই উপর জোর দিলেন–

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।।১৬।।

হে পার্থ! যে ব্যক্তি ইহলোকে মনুষ্যদেহ লাভ করে এই সাধন চক্রের অনুসারে অনুষ্ঠান করে না অর্থাৎ দৈবী সম্পদের উৎকর্ষ, দেবতাগণের বৃদ্ধি এবং পরস্পর বৃদ্ধিদ্বারা অক্ষয়ধামলাভ- এই ক্রম অনুসারে যে কর্মে প্রবৃত্ত হয় না, ইন্দ্রিয়গুলির সুখাকাঙ্ক্ষী সেই 'পাপী ব্যক্তি' বৃথা জীবন ধারণ করে।

বন্ধুগণ! যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে শুধু কর্মের নাম নিয়েছেন এবং বর্তমান অধ্যায়ে বলছেন যে, নিয়ত কর্মের আচরণ কর। যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম। এছাড়া যা কিছু করা হয়, তা এই লোকেরই বন্ধন। এই কারণে সঙ্গদোষ থেকে পৃথক অবস্থান করে যজ্ঞের পূর্তির জন্য কর্মের আচরণ কর। তিনি যজ্ঞের বিশেষত্বের উপর আলোকপাত করলেন এবং বললেন– যজ্ঞের উৎপত্তি হয়েছে ব্রহ্মা থেকে। প্রজা অন্নকে উদ্দেশ্য করে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়। যজ্ঞ কর্ম থেকে এবং কর্ম অপৌরুষেয় বেদ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। বেদমন্ত্রগুলির দ্রষ্টা মহাপুরুষগণ ছিলেন। তাঁদের পুরুষ তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। প্রাপ্তির পর শেষে অবিনাশী পরমাত্মাই শুধু থাকেন, সেইজন্য বেদ পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন। সর্বব্যাপী পরমাত্মা সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। এই সাধন-চক্র অনুসারে যে আচরণ করে না, সেই পাপী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহের সুখাকাঙ্ক্ষী, ব্যর্থই জীবন ধারণ করে অর্থাৎ যজ্ঞ এমন বিধি, যাতে ইন্দ্রিয়গুলির বিশ্রাম নেই, বরং অক্ষয় সুখ বিদ্যমান। ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম করে এর আচরণ করবার বিধান। ইন্দ্রিয়সমূহের সুখ-আকাঙ্ক্ষী যারা, তারা পাপী। এখনও শ্রীকৃষ্ণ বলছেন না, যজ্ঞ কি? কিন্তু এই যজ্ঞ কি সারাজীবন করে যেতে হবে অথবা কখনও সম্পূর্ণও হবে? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর বলছেন-

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।

আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে।।১৭।।

কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট তাঁর জন্য কোন কর্তব্য বাকী থাকে না। এই হল লক্ষ্য। যখন অব্যক্ত, সনাতন, অবিনাশী আত্মতত্ত্ব লাভ হয়ে যায়, তখন আর কার অনুসন্ধান করা হবে? এরূপ পুরুষের কর্মের, আরাধনার প্রয়োজন হয় না। আত্মা ও পরমাত্মা একে অন্যের পর্যায়ভুক্ত। এর পুনরায় বর্ণনা করলেন-

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ।।১৮।।

এই সংসারে সেই পুরুষের কর্ম করেও কোন লাভ নেই এবং কর্ম না করলেও কোন লোকসান নেই; কিন্তু আত্মতত্ত্ব লাভ হওয়ার পূর্বে এর প্রয়োজন ছিল। তাঁর সমগ্র প্রাণীজগতের সঙ্গে কোন স্বার্থ-সম্বন্ধ থাকে না। আত্মাই শাশ্বত, সনাতন, অব্যক্ত, অপরিবর্তনশীল ও অক্ষয়। যখন আত্মলাভ হয়ে গেছে ও তাতেই সন্তুষ্ট, তাতেই তৃপ্ত, তাতেই ওতপ্রোত এবং স্থিত আছেন, যখন এর থেকে শ্রেষ্ঠ কোন সত্তা নেই, তখন কার খোঁজ করা হবে? কি লাভ হবে? সেই পুরুষের কর্ম ত্যাগ করলেও কোন ক্ষতি নেই, কারণ বিকারের চিহ্ন যে চিত্তে পড়ে, সেই চিত্তই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাঁর সকলভূতে, বাহ্য জগতে এবং আন্তরিক সঙ্কল্পের স্তরে কোন উদ্দেশ্য থাকে না। সবথেকে বড় উদ্দেশ্য ছিল পরমাত্মাকে লাভ করা, যখন তাঁকে লাভ করেছেন, তখন অন্য কারুকে তাঁর কি প্রয়োজন?

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ।।১৯।।

সেই স্থিতি লাভ করবার জন্য তুমি অনাসক্ত হয়ে নিরন্তর '**কার্যং কর্ম**'-করণীয় যে কর্ম, উত্তমরূপে সেই কর্মের অনুষ্ঠান কর। কারণ অনাসক্ত পুরুষ কর্মের অনুষ্ঠান করে পরমাত্মাকে লাভ করেন। 'নিয়ত কর্ম', 'কার্যং কর্ম' এক। কর্মের প্রেরণা দিয়ে তিনি বললেন—

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসঙ্গ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্তুমর্হসি।।২০।।

জনকের তাৎপর্য রাজা জনক নয়। জনক জন্মদাতাকে বলে। যোগই জনক, আপনার স্বরূপকে জন্ম দেয়, প্রকট করে। যোগসংযুক্ত প্রত্যেক মহাপুরুষ জনক।

এরূপ যোগ-সংযুক্ত বহু ঋষি '**জনকাদয়ঃ**'- জনক ও এই শ্রেণীর সমস্ত জ্ঞানী মহাপুরুষ ও '**কর্মণা এব হি সংসিদ্ধিম্**'- কর্ম করেই পরমসিদ্ধি লাভ করেছেন। পরমসিদ্ধির অর্থ হল পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে লাভ করা। প্রাচীনকালে জনক ও এই শ্রেণীর যত মহর্ষি হয়েছেন, এই 'কার্যং কর্মের' দ্বারা, যা যজ্ঞের প্রক্রিয়া, এই কর্ম করেই '**সংসিদ্ধিম্**'- পরমসিদ্ধি লাভ করেছেন। কিন্তু লাভ করবার পর তাঁরাও লোক-সংগ্রহের জন্য কর্ম করেন, লোক-কল্যাণের জন্য কর্ম করেন। অতএব তুমি প্রাপ্তির পর লোকনায়ক হওয়ার জন্য কর্ম করবার উপযুক্ত। কেন?

এখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, লাভ করবার পর মহাপুরুষের কর্ম করলে কোন লাভ হয়ে না এবং কর্ম না করলেও তাঁর কোন লোকসান হয় না। পুনরপি লোকসংগ্রহ, লোকহিতের জন্য তাঁরা উত্তমরূপে কর্মের অনুষ্ঠান করেন।

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।।২১।।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা' আচরণ করেন, সাধারণ লোকে তা তাই অনুকরণ করে। সেই মহাপুরুষ যা কিছু প্রমাণ করে দেন, অন্য লোকে তাই অনুসরণ করে।

পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে স্থিত, আত্মতৃপ্ত মহাপুরুষের অবস্থিতির উপর আলোকপাত করেছেন যে, তাঁদের কর্ম করলে কোন লাভ হয় না এবং ত্যাগ করলে কোন লোকসানও হয় না। তা'সত্ত্বেও জনকাদি উত্তমরূপে কর্মের অনুষ্ঠান করতেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সেই মহাপুরুষগণের সঙ্গে নিজের তুলনা করেছেন যে তিনিও মহাপুরুষ।

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি।।২২।।

হে পার্থ! তিনলোকে আমার কোন কর্তব্য নেই। পূর্বে বলেছেন যে, সেই মহাপুরুষের সর্বভূতের প্রতি কোন কর্তব্য নেই। এখানে বলছেন, তিন লোকে আমার কোন কর্তব্য বাকী নেই এবং লাভের যোগ্য বস্তু কিঞ্চিন্মাত্র লাভ করতে বাকী নেই, তাসত্ত্বেও আমি উত্তম প্রকার কর্মের আচরণ করি। কেন?–

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।২৩।।

কারণ যদি আমি সাবধান হয়ে কর্ম না করি, তাহলে মনুষ্যগণ আমার অবলম্বিত পথেরই অনুগামী হবে। তাহলে আপনার অনুকরণ কি খারাপ? শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হ্যাঁ!

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।

সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।।২৪।।

যদি আমি সাবধান হয়ে কর্ম না করি, তাহলে এই সকল লোক ভ্রষ্ট হবে এবং আমি '**সঙ্করস্য**'- বর্ণসঙ্করের সৃষ্টিকর্ত্তা হব এবং এই সকল প্রজার বিনাশের কারণ হব।

স্বরূপে স্থিত মহাপুরুষ সতর্ক হয়ে যদি আরাধনা-ক্রমে প্রবৃত্ত না থাকেন, তাহলে সমাজ তাঁর অনুকরণ করে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তিনি না করলেও, তাঁর কোন লোকসান নেই, কারণ তিনি আরাধনা সম্পূর্ণ করে নিবৃত্ত হয়েছেন; কিন্তু সমাজ তো এখনও আরাধনা আরম্ভই করেনি। অনুগামীদের পথ-প্রদর্শনের জন্যই মহাপুরুষ কর্ম করেন, আমিও করি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি বৈকুণ্ঠ থেকে অবতরিত কোন বিশিষ্ট ভগবান ছিলেন না। তিনি বললেন, মহাপুরুষ লোককল্যাণের জন্য কর্ম করেন, আমিও করি। আমি যদি না করি, তাহলে মানুষ আদর্শভ্রষ্ট হবে, সকলেই কর্মত্যাগ করবে।

মন বড় চঞ্চল। সবকিছু পেতে চায়, কেবল ভজন করতে চায় না। স্বরূপস্থ মহাপুরুষ যদি কর্ম না করেন, তবে তাঁকে দেখে অনুগামীগণও কর্ম ত্যাগ করবে। অজুহাত দেখাবে যে, ইনি তো ভজন করেন না, পান খান, সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করেন, সামান্যজনের মত কথা বলেন, তবুও এঁকে মহাপুরুষ বলে সমাদর করা হয়–এরূপ চিন্তন করে তারাও আরাধনা ত্যাগ করে, আদর্শভ্রষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ বললেন– যদি আমি কর্ম না করি, তাহলে সকলেই ভ্রষ্ট হবে এবং আমি বর্ণসঙ্কর দোষের মূলকারণ হব।

স্ত্রীগণ কলুষিত হলে বর্ণসঙ্করের প্রভাব দেখা যায়। অর্জুনও এই ভয়ে ব্যাকুল ছিলেন যে স্ত্রীগণ কলুষিত হলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হবে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বললেন—যদি আমি সাবধান হয়ে আরাধনায় রত না থাকি, তাহলে বর্ণসঙ্কর দোষের মূলকারণ আমি হব। বস্তুতঃ আত্মার শুদ্ধবর্ণ পরমাত্মা। নিজের শাশ্বত স্বরূপের পথ থেকে

ভ্রষ্ট হওয়াই বর্ণসঙ্করতা। স্বরূপস্থ মহাপুরুষ আরাধনা-ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত না থাকলে অনুগামীগণ তাঁকে অনুকরণ করতে গিয়ে ক্রিয়ারহিত হয়ে যাবে, আত্মপথ থেকে ভ্রষ্ট হবে, বর্ণসঙ্কর হ'য়ে যাবে। তারা প্রকৃতির মোহে মুগ্ধ হবে।

স্ত্রীগণের সতীত্ব এবং জাতির শুদ্ধতা, এগুলি সামাজিক ব্যবস্থা, অধিকারের প্রশ্ন, সমাজের পক্ষে এর উপযোগিতাও আছে; কিন্তু মাতা-পিতার ভুলের কোন প্রভাব সন্তানের সাধনার উপর পড়ে না। **'আপন করনী পার উতরনী।'** হনুমান, ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ, শুকদেব, কবীর, যীশু ইত্যাদি উত্তম মহাপুরুষ হয়েছিলেন; কিন্তু সামাজিক কুলীনতার সঙ্গে এঁদের কোন সম্পর্ক ছিল না। আত্মা নিজের পূর্বজন্মের গুণধর্ম সঙ্গে নিয়ে আসে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন– **'মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।'** **(১৫/৭)** মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যে কাজ এই জন্মে করা হয়, সেই সংস্কার নিয়ে জীবাত্মা পুরানো দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহে প্রবেশ করে। এতে জন্মদাতাদের কোন ভূমিকা নেই। তাঁদের বিকাশ-ক্রমে কোন ব্যবধানের সৃষ্টি হয় না। অতএব স্ত্রীগণ কলুষিত হলে বর্ণসঙ্কর হয় না। স্ত্রীগণের কলুষিত হওয়া ও বর্ণসঙ্করের মধ্যে সম্পর্ক নেই। শুদ্ধ স্বরূপের দিকে অগ্রসর না হয়ে, প্রকৃতিতে মুগ্ধ হওয়াকেই বর্ণসঙ্কর বলে।

মহাপুরুষ যদি সাবধান হয়ে ক্রিয়াতে (নিয়ত কর্মে) প্রবৃত্ত না থাকেন এবং অন্য লোকেদের দিয়ে ক্রিয়া না করান, তাহলে তিনি সেই সকল প্রজার হননকারী, বিনাশক হন। সাধনা-ক্রমে চলে সেই মূল অবিনাশীকে লাভ করাই জীবন এবং প্রকৃতিতে মুগ্ধ হওয়া, পথভ্রষ্ট হওয়াই মৃত্যু; কিন্তু মহাপুরুষ যদি এই সকল প্রজাদের ক্রিয়া-পথে চালিত না করেন, সেই সকল প্রজাদের সংযত করে সৎপথে না চালান, তাহলে তিনি সকল প্রজার হননকর্ত্তা, হিংসক হবেন এবং যিনি স্বয়ং চলে অন্যকেও সেই পথে চালান, তিনিই শুদ্ধ অহিংসক। গীতাশাস্ত্র অনুসারে দেহের মৃত্যু নশ্বর কলেবরের মৃত্যু, পরিবর্তন মাত্র, হিংসা নয়।

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।

কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসঙ্গ্রহম্।।২৫।।

হে ভারত! অজ্ঞানীগণ আসক্ত হয়ে যেরূপ কর্ম করেন, পূর্ণজ্ঞাতা বিদ্বান্ অনাসক্ত হয়ে লোক-হৃদয়ে প্রেরণা এবং কল্যাণ-সংগ্রহের জন্য সেইরূপ কর্ম করেন।

যজ্ঞের বিধি জেনেও, করেও আমরা অজ্ঞানী। জ্ঞানের অর্থ হল প্রত্যক্ষভাবে জানা। যতক্ষণ আমরা লেশমাত্রও আরাধ্য থেকে পৃথক ততক্ষণ অজ্ঞান বিদ্যমান, যতক্ষণ অজ্ঞান বিদ্যমান ততক্ষণ কর্মে আসক্তি থাকে। অজ্ঞানী যতটা আসক্ত হয়ে আরাধনা করেন, ততটাই অনাসক্তও। যাঁর কর্ম করবার প্রয়োজন নেই, তাঁর আসক্তি কেন হবে? এরূপ পূর্ণজ্ঞাতা মহাপুরুষও লোকহিতের জন্য কর্মে করেন, দৈবী সম্পদের উৎকর্ষ করেন, যাতে সমাজ সেই পথে চলতে পারে।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।

জোষয়েৎসর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।।২৬।।

জ্ঞানী পুরুষের লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে কর্মে আসক্ত অজ্ঞানীগণের বুদ্ধিভ্রম না হয় অর্থাৎ স্বরূপস্থ মহাপুরুষগণ সতর্ক হয়ে আচরণ করবেন, যাতে অনুগামীদের মনে কর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয়। পরমাত্মতত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত মহাপুরুষের উচিত যে, স্বয়ং উত্তমরূপে নির্ধারিত কর্ম করে, তাদেরও সেই কর্ম করবার জন্য প্রেরণা দেন।

এই কারণেই চিত্রকূট, অনুসূইয়া আশ্রমে 'পূজ্য মহারাজজী' বৃদ্ধাবস্থাতেও রাত দুটোয় উঠে বসতেন ও রাত তিনটেয় আশ্রমবাসী সাধকদের ডেকে তুলে বলতেন- "মাটির পুতুলরা ওঠো সবাই।" আশ্রমবাসীগণ উঠে যে যার চিন্তন-ক্রিয়ায় মগ্ন হয়ে যেতেন। তখন তিনি কিছুক্ষণ গড়িয়ে, পুনরায় উঠে বসতেন এবং বলতেন- "তোমরা মনে চিন্তন কর যে মহারাজজী শুয়ে আছেন; কিন্তু আমি ঘুমাই না, শ্বাস-ক্রিয়ায় রত আছি। এখন বৃদ্ধাবস্থা বসতে কষ্ট হয়, তাই আমি পড়ে থাকি; কিন্তু তোমাদের তো স্থির ও সোজা হয়ে বসে চিন্তন করা উচিত। যতক্ষণ তৈলধারার মত শ্বাস-ক্রিয়ায় ক্রমভঙ্গ না হয়, মাঝে কোন সংকল্প যাতে ব্যবধান উৎপন্ন না করতে পারে, ততক্ষণ সতত প্রবৃত্ত থাকা সাধকের ধর্ম। আমার শ্বাস এখন বাঁশের মত স্থির দাঁড়িয়ে গেছে।" অনুগামীদের জন্য মহাপুরুষগণ উত্তম রূপে কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন। "**জিস গুণকো শিখাবৈ, উসে করকে দিখাবৈ**।" অর্থাৎ আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।

এইরূপ স্বরূপস্থ মহাপুরুষের উচিত যে স্বয়ং কর্মে প্রবৃত্ত থেকে সাধকদেরও আরাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য প্রেরণা দেন। সাধকদেরও শ্রদ্ধাপূর্বক আরাধনা-

ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত; কিন্তু জ্ঞানযোগী হউন অথবা নিষ্কাম কর্মযোগী, সাধকের অহংকার হওয়া উচিত নয়। কারদ্বারা কর্ম হয়? কর্ম সম্পাদনের কারণ কি? এর উপর শ্রীকৃষ্ণ আলোকপাত করলেন—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।।২৭।।

আরম্ভ থেকে পূর্ণহওয়া পর্যন্ত কর্ম প্রকৃতির গুণত্রয়দ্বারা সম্পাদিত হয়, তা সত্ত্বেও অহঙ্কারে যিনি বিশেষরূপে মূঢ়, তিনি 'আমি কর্তা'-এরূপ মনে করেন। একথা কিরূপে স্বীকার করা হবে যে, আরাধনা প্রকৃতির গুণে হয়? এটা কে দেখেছেন? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।।২৮।।

হে মহাবাহো! গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগকে '**তত্ত্ববিৎ**'- পরমতত্ত্ব পরমাত্মার সম্যক্ জ্ঞানবিশিষ্ট মহাপুরুষগণ দেখেছেন এবং সম্পূর্ণ গুণ, গুণসমূহে বর্তিত।— এরূপ চিন্তা করে তাঁরা গুণ এবং কর্মের কর্তৃত্বে আসক্ত হন না।

এখানে তত্ত্বের অর্থ পরমতত্ত্ব পরমাত্মা, পাঁচটা অথবা পঁচিশটা তত্ত্ব নয়, লোকে যেমন গণনা করে থাকে। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে তত্ত্ব একমাত্র পরমাত্মা, অন্য কোন তত্ত্ব নেই। গুণীতীত হয়ে পরমতত্ত্ব পরমাত্মায় স্থিত মহাপুরুষ গুণের অনুসারে কর্মগুলির বিভাজন দেখতে পান। তামসিক গুণের প্রভাবে আলস্য, নিদ্রা, প্রমাদ, কর্মে প্রবৃত্ত না হওয়ার স্বভাব দেখা যায়। রাজসিক গুণের প্রভাবে-আরাধনা থেকে সরে না আসার স্বভাব, শৌর্য এবং স্বামীভাব দেখা যায়। সাত্ত্বিক গুণ কার্যরত হলে—ধ্যান, সমাধি, অনুভবে উপলব্ধি, নিবন্তর চিন্তন, সারল্য স্বভাবে হবে। গুণ পরিবর্তনশীল। প্রত্যক্ষদর্শী জ্ঞানীই বুঝতে পারেন গুণ অনুসারে কর্মের উৎকর্ষ-অপকর্ষ হয়। গুণ নিজের কর্ম করিয়ে নেয় অর্থাৎ গুণ গুণে বর্তিত হয়— এরূপ চিন্তা করে প্রত্যক্ষদ্রষ্টা কর্মে আসক্ত হন না; কিন্তু যিনি গুণের অতীত হতে পারেননি, এখনও পথিক তাঁকে কর্মে আসক্ত থাকতে হবে। সেইজন্য—

প্রকৃতের্গুণসম্মূঢাঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ।।২৯।।

প্রকৃতির গুণের দ্বারা মুগ্ধ পুরুষগণ কর্মে ক্রমশঃ নির্মল গুণের উন্নতি দেখে তাতে আসক্ত হন। সেই অসম্পূর্ণ জ্ঞানবিশিষ্ট **'মন্দান্'**- শিথিল চেষ্টা যাদের, তাদের উত্তম জ্ঞানসম্পন্ন জ্ঞানীপুরুষ চালিত করবেন না। তাদের হতোৎসাহ করবেন না, উৎসাহ দেবেন, কারণ কর্ম করেই পরম নৈষ্কর্ম্য স্থিতি লাভ হবে। নিজের শক্তি ও স্থিতি বুঝে কর্মে প্রবৃত্ত জ্ঞানমার্গী সাধকের উচিত যে, গুণের প্রভাবে কর্মের আচরণ হচ্ছে বলে যেন মনে করেন, নিজেকে কর্তা ভেবে অহঙ্কারী যেন না হয়ে যান, নির্মল গুণলাভ হলেও তাতে আসক্ত যেন না হন। কিন্তু নিষ্কাম কর্মযোগীর কর্ম এবং গুণের বিশ্লেষণ করে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। তাঁকে আত্মসমর্পণ করে শুধু কর্মে প্রবৃত্ত থাকতে হবে। কোন গুণ কার্যরত, তা দেখার ভার ইষ্টের। গুণের পরিবর্তন এবং ক্রমশ উত্থান তিনি ইষ্টের কৃপা বলে মনে করেন, কর্মের আচরণও তাঁরই কৃপা বলে মনে করেন। অতএব আমি কর্তা এই অহঙ্কার অথবা গুণে আসক্ত হওয়ার সমস্যা তাঁর থাকে না। তিনি তো অনবরত প্রবৃত্ত থাকেন। এই প্রসঙ্গে এর সঙ্গে যুদ্ধের স্বরূপ বর্ণনা করে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।

নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।। ৩০।।

সেইজন্য অর্জুন! তুমি **'অধ্যাত্মচেতসা'**- অন্তরাত্মায় চিত্তকে নিরুদ্ধ করে, ধ্যানস্থ হয়ে, কর্মগুলি আমাতে সমর্পণ করে আশা-মমতা ও শোকশূন্য হয়ে যুদ্ধ কর। যখন চিত্ত ধ্যানস্থ, লেশমাত্র কিছু পাওয়ার আশা নেই, কর্মের প্রতি আসক্তি নেই, অসফলতার সন্তাপ নেই, তখন সেই পুরুষ যুদ্ধ কি করবেন? যখন চারিদিক্ থেকে চিত্ত সংযত হয়ে হৃদয়-দেশে নিরুদ্ধ হয়ে আসছে, তখন সেই পুরুষ যুদ্ধ করতে যাবেন কেন? কার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন? সেস্থানে কে বা আছে? বাস্তবে যখন আপনি ধ্যান করতে আরম্ভ করবেন, তখনই যুদ্ধের আসল স্বরূপ আপনি বুঝতে পারবেন। কাম-ক্রোধ, রাগ-দ্বেষ, আশা-তৃষ্ণা ইত্যাদি বিকারসমূহ, বিজাতীয় প্রবৃত্তিগুলি যাদের 'কুরু' বলা হয়, এরা সংসারে যাতে প্রবৃত্তি হয় তারই চেষ্টা করবে। বিঘ্নরূপে ভয়ঙ্কর আক্রমণ করবে। এদের সঙ্গে সংঘর্ষের নামই যুদ্ধ। একে অতিক্রম করে যাওয়াই হ'ল বাস্তবিক যুদ্ধ। এদের নিশ্চিহ্ন করে, অন্তরাত্মায় মনকে স্থির করা, ধ্যানস্থ হওয়াই যথার্থ যুদ্ধ। এর উপর পুনরায় জোর দিলেন–

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।

শ্রদ্ধাবন্তোহনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেহপি কর্মভিঃ।। ৩১।।

অর্জুন ! যাঁরা দোষ-দৃষ্টিশূন্য হয়ে, শ্রদ্ধাবান্, আত্মসর্মণের সঙ্গে আমার এই মতের সর্বদা অনুষ্ঠান করেন যে, 'যুদ্ধ কর', তাঁরা সকল কর্ম থেকে মুক্ত হন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এই আশ্বাস কেবল হিন্দু, মুসলমান অথবা খৃষ্টানদের জন্য নয়, বরং মানুষ মাত্রের জন্য। তাঁর বাণী হ'ল 'যুদ্ধ কর'। এই আদেশ থেকে এই মনে হয় যেন এই উপদেশ কেবল যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের জন্যই ছিল। অর্জুনের সম্মুখে সৌভাগ্যবশতঃ বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি ছিল; কিন্তু আপনার সম্মুখে কোন যুদ্ধ স্থিতি নেই। তাহলে গীতাশাস্ত্রের উপদেশ আপনার কি কাজে লাগবে ? কারণ কর্ম থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় যুদ্ধ। এটা তাঁদের জন্য বিবৃত করা হয়েছে। বাস্তবে কিন্তু তা নয়। বস্তুতঃ এটা অন্তর্দেশের যুদ্ধ। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের, বিদ্যা এবং অবিদ্যার, ধর্মক্ষেত্র এবং কুরুক্ষেত্রের সংঘর্ষ। আপনি যেমন যেমন ধ্যানে চিত্তকে নিরুদ্ধ করবার চেষ্টা করবেন, তেমন তেমন বিজাতীয় প্রবৃত্তিগুলি বিঘ্নরূপে ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করবে। তাদের শান্ত করে, চিত্তকে নিরুদ্ধ করার চেষ্টাই যুদ্ধ। যিনি দোষ-দৃষ্টিমুক্ত হয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তিনি কর্মবন্ধন থেকে, বার বার আসা-যাওয়া থেকে, সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যান। যারা এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না, তাদের কেমন গতি হয় ? এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।

সর্বজ্ঞানবিমূঢাংস্তান্বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ।। ৩২।।

যে দোষ-দৃষ্টিযুক্ত **'অচেতসঃ'**- মোহনিশাতে অচেতন ব্যক্তিগণ আমার এই মতের অনুসারে অনুষ্ঠান করে না অর্থাৎ ধ্যানস্থ হয়ে আশা-মমতা-সন্তাপরহিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না, **'সর্বজ্ঞানবিমূঢান্'**- জ্ঞানপথে সর্বদা মোহমুগ্ধ সেই ব্যক্তিগণকে তুমি কল্যাণভ্রষ্টই জানবে। যদি এটাই সত্য, তাহলে লোকে এর অনুষ্ঠান করে না কেন ? এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।। ৩৩।।

সকল প্রাণী নিজের প্রকৃতিকে অনুসরণ করে, স্বীয় স্বভাবের বশীভূত হয়ে কর্মে অংশগ্রহণ করে। প্রত্যক্ষদর্শী জ্ঞানীও নিজের প্রকৃতির অনুরূপ কার্য করেন। প্রাণী নিজের কর্ম অনুসারে আচরণ করে, জ্ঞানী নিজ স্বরূপ অনুসারে। যেমন যার প্রকৃতির প্রভাব, সে সেরকমই কার্য করে থাকে। এটা স্বতঃসিদ্ধ। কেউ এর হাত থেকে নিস্তার পায় না। এই কারণেই সবাই আমার মতানুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারে না। তারা আশা, মমতা, সন্তাপ, শব্দান্তরে রাগ-দ্বেষ এদের ত্যাগ করতে পারে না, যার জন্য কর্মের সম্যক্ আচরণ হয় না। একেই আরও স্পষ্ট করলেন এবং অন্য কারণ দেখালেন—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ।। ৩৪।।

ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গুলির ভোগে রাগ-দ্বেষ স্থিত। এই দুটির বশীভূত হওয়া উচিত নয়, কারণ এই কল্যাণপথে কর্মমুক্ত হওয়ার প্রণালীতে এই রাগ ও দ্বেষ দুর্ধর্ষ শত্রু, আরাধনাতে বাধার সৃষ্টি করে। শত্রু যখন অন্তরে, তখন বাইরে কার সঙ্গে কে যুদ্ধ করবে? ইন্দ্রিয় এবং ভোগের সংসর্গে শত্রু থাকে, আমাদের অন্তঃকরণেই বাস করে। কাজেই এই যুদ্ধও অন্তঃকরণের যুদ্ধ। কারণ দেহটাই ক্ষেত্র, যার মধ্যে দুটি প্রবৃত্তি সজাতীয় এবং বিজাতীয়, বিদ্যা এবং অবিদ্যা থাকে। যারা মায়ারই দুটি অঙ্গ। এই প্রবৃত্তিগুলির অতীত হওয়া, সজাতীয় প্রবৃত্তিকে আয়ত্ত করে বিজাতীয়কে নিশ্চিহ্ন করাই যুদ্ধ। বিজাতীয় নিশ্চিহ্ন হলে সজাতীয়ের উপযোগিতা আর থাকে না। স্বরূপের ছোঁয়ায় সজাতীয় তার অন্তরালে বিলীন হয়ে যায়। এইভাবে প্রকৃতির পার পাওয়াই যুদ্ধ, যা ধ্যানদ্বারা সম্ভব।

রাগ-দ্বেষ শান্ত করতে সময় লাগে, সেইজন্য বহু সাধক ক্রিয়াত্যাগ করে সহসা মহাপুরুষের অনুকরণ করতে আরম্ভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ এর থেকে সাবধান করলেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।। ৩৫।।

একজন সাধক দশ বছর ধরে সাধনায় প্রবৃত্ত এবং অন্য একজন আজ সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছে। উভয়ের ক্ষমতা এক হবে না। প্রারম্ভিক সাধক যদি তাঁর অনুকরণ

করে, তাহলে সে তার নিজের যোগ্যতাটুকুও হারিয়ে ফেলবে। এই প্রসঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, উত্তমরূপে আচরিত পরধর্ম অপেক্ষা গুণরহিত নিজধর্ম অধিক উত্তম। কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার স্বভাবজাত ক্ষমতাই স্বধর্ম। নিজের ক্ষমতা অনুসারে সাধক কর্মে প্রবৃত্ত হলে একদিন মুক্তিলাভ করে। অতএব স্বধর্ম আচরণে মৃত্যুও পরম কল্যাণকর। যেখানেই সাধনে ছেদ পড়ে, আবার দেহলাভ করার পর সেখান থেকেই পুনরায় যাত্রা আরম্ভ হয়। আত্মার মৃত্যু হয় না। (দেহের) বস্ত্রের পরিবর্তন হলেও বিচার, বুদ্ধি বদলায় না। নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অনুকরণ করতে আরম্ভ করলে সাধক ভয় পাবেন। ভয় প্রকৃতিতে, পরমাত্মায় নয়। প্রকৃতির আবরণ আরও ঘনীভূত হবে।

ভগবৎ পথে অনুকরণের বাহুল্য দেখা যায়। একবার পূজ্য মহারাজজীর প্রতি আকাশবাণী হয়েছিল যে, তিনি যেন অনুসূইয়াতে গিয়ে বসবাস করেন, তখন তিনি জম্মু থেকে চিত্রকূট এসেছিলেন এবং অনুসূইয়ার ঘোর জঙ্গলে বাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। অনেক মহাত্মা ঐপথ দিয়ে যাতায়াত করতেন। তাঁদের মধ্যে একজন লক্ষ্য করেছিলেন যে, পরমহংসজী দিগম্বর অবস্থাতে থাকেন এবং তাঁর সম্মানও অনেক, তখন সেই মহাত্মাও কৌপীন ত্যাগ করলেন, দণ্ড-কমণ্ডলু অন্য এক সাধুকে দিয়ে ত্যাগী দিগম্বর সেজে বসলেন। কিছুকাল পরে এসে দেখলেন, পরমহংসজী লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, প্রয়োজন মত সময় সময় তাড়না দেওয়ার ছলে অপশব্দও ব্যবহার করেন। মহারাজজীর প্রতি আদেশ হয়েছিল, তিনি যেন ভক্তদের কল্যাণার্থে কিছু তিরস্কার করেন, এই পথের পথিকদের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখেন। মহারাজের অনুকরণ করে সেই মহাত্মাও গালাগাল দিতে আরম্ভ করলেন; কিন্তু তার পরিবর্তে লোকেও তাঁকে ভাল-মন্দ দুকথা শুনিয়ে দিত। তিনি তখন বলেছিলেন—পরমহংসজীকে কেউ কিছু বলে না আর এখানে তো মুখে মুখে জবাব দিচ্ছে।

বছর দুই পরে ফিরে এসে সেই মহাত্মা দেখেছিলেন যে পরমহংসজী গদিতে বসে, লোকে পাখা দিয়ে বাতাস করছে, চামর ব্যজন করছে। তিনিও দেখাদেখি সেই জঙ্গলের এক ভাঙ্গা বাড়ীতে তক্তাপোশ আনিয়ে, তাতে গদি পেতে, দুটি লোক নিযুক্ত করলেন, চামর ব্যজন করবার জন্য। প্রতি সোমবার ভীড়ও হতে লাগল, পুত্রের ইচ্ছুক পঞ্চাশ টাকা দিন, কন্যার ইচ্ছুক পঁচিশ টাকা দিন; পরন্তু কথায় বলে

‘উঘরে অন্ত ন হোই নিবাহূ।’ এক মাসের মধ্যেই সেই সাধুকে সেস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে হয়েছিল। মান-প্রতিষ্ঠা সব খুইয়ে বসেছিলেন। এই ভগবৎ-পথে অনুকরণের কোন স্থান নেই। সাধককে স্বধর্মেরই আচরণ করা উচিত।

স্বধর্ম কি ? দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্মের নাম নিয়েছিলেন যে, স্বধর্ম লক্ষ্য করলেও, তুমি যুদ্ধ করার উপযুক্ত পাত্র। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কল্যাণকর পথ ক্ষত্রিয়ের জন্য আর নেই। স্বধর্মে অর্জুন ক্ষত্রিয়। যোগেশ্বর সঙ্কেত করলেন যে, অর্জুন ! যাঁরা ব্রাহ্মণ, তাঁদের জন্য বেদের উপদেশ ক্ষুদ্র জলাশয়ের তুল্য। তুমি বেদের ঊর্ধ্বে ওঠ এবং ব্রাহ্মণ হও, অর্থাৎ স্বধর্মে পরিবর্তন সম্ভব। এখানে পুনরায় বললেন—রাগ-দ্বেষের বশীভূত হয়ো না। এদের কাটিয়ে ওঠ। স্বধর্মই শ্রেয়স্কর– তাঁর বলবার অর্থ এই নয় যে অর্জুন কোন ব্রাহ্মণের অনুকরণ করে তাঁর মত বেশ-ভূষা ধারণ করুক।

কর্মের একমাত্র পথকেই মহাপুরুষগণ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন– নিকৃষ্ট, মধ্যম, উত্তম এবং অতি উত্তম। এই শ্রেণী বিভাগকে সাধকের জন্য ক্রমশঃ শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের নাম দিলেন। শূদ্র স্থিতি (সেবাধর্ম) থেকে কর্মের আরম্ভ হয় এবং সাধনা ক্রমে ঐ সাধকেই ব্রাহ্মণের স্থিতিলাভ করতে পারেন। এর পরের অবস্থাতে সাধক যখন পরমাত্মায় স্থিতিলাভ করেন, তখন **‘ন ব্রাহ্মণো ন ক্ষত্রিয়ঃ ন বৈশ্যো ন শূদ্রঃ চিদানন্দরূপঃ শিবোহহম্ শিবোহহম্**।’ তিনি বর্ণগুলির ঊর্ধ্বে উঠে যান। এ কথাই শ্রীকৃষ্ণও বললেন যে, ‘**চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্**’- এই চারবর্ণের সৃষ্টি কর্তা আমি। তাহলে কি জন্মের আধারে মানুষের জাতি-বিভাগ করা হয়েছে ? না, ‘**গুণকর্ম বিভাগশঃ**’– গুণের আধারে কর্ম-বিভাগ করেছি। কর্ম কি ? তা কি সাংসারিক কর্ম ? শ্রীকৃষ্ণ বললেন– না, তা হল নিয়ত কর্ম। এই নিয়ত কর্ম কি ? তিনি বললেন– যজ্ঞের প্রক্রিয়াই নিয়ত কর্ম, যার দ্বারা নিঃশ্বাস (প্রাণ)কে প্রশ্বাসে (অপানে) আহুতি, প্রশ্বাস (অপান)কে নিঃশ্বাসে (প্রানে) আহুতি, ইন্দ্রিয় সংযম ইত্যাদি। যার শুদ্ধ অর্থ হ’ল আরাধনা, যোগসাধনা। আরাধ্যদেবপর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় যে বিধি-বিশেষ তা হল আরাধনা। এই আরাধনা কর্মকেই চারটি শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়েছে। যার যেমন ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা অনুযায়ীই তাকে নিজ শ্রেণী থেকেই আরম্ভ করা উচিত। একেই বলে সকলের নিজ নিজ ধর্ম। যদি কেউ শ্রেষ্ঠ পুরুষের অযৌক্তিক অনুকরণ করে, তাহলে তা বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তার নাশ হবে না, কারণ এতে বীজের নাশ নেই; কিন্তু সে প্রকৃতির চাপে ভয়াক্রান্ত,

দীন-হীন নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। যদি প্রথম শ্রেণীর কোন ছাত্র স্নাতক শ্রেণীতে বসতে আরম্ভ করে তাহলে কি তার পাঠ্য-বিষয় বোধগম্য হবে? সে প্রারম্ভিক বর্ণমালা থেকেও বঞ্চিত হয়ে যাবে। অর্জুন প্রশ্ন করলেন যে, মানুষ স্বধর্মের আচরণ করতে পারে না, কেন?–

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।।৩৬।।

হে কৃষ্ণ! মানুষ কারদ্বারা চালিত হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন বলপূর্বক নিযুক্ত হয়ে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়? আপনার মতানুসারে চলতে পারে না কেন? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন–

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্‌মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্‌।। ৩৭।।

অর্জুন! রজোগুণজাত এই কাম এবং এই ক্রোধ অগ্নির ন্যায় ভোগে অতৃপ্ত অত্যন্ত পাপী। কাম-ক্রোধ রাগ-দ্বেষের পূরক। একটু আগেই আমি যার চর্চা করেছি, এই বিষয়ে তুমি এদেরই শত্রু জানবে। এখন এদের প্রভাব সম্বন্ধে বলছেন–

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্‌।। ৩৮।।

যেরূপ ধূমদ্বারা অগ্নি, ময়লাদ্বারা দর্পণ এবং ঝিল্লী দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেরূপ কাম-ক্রোধাদি বিকারসমূহ দ্বারা এই জ্ঞান আবৃত থাকে। ভেজা কাঠ জ্বালালে কেবল ধোঁয়াই হয় আগুণ থাকা সত্ত্বেও শিখাররূপ নিতে পারে না, ময়লা দিয়ে ঢাকা দর্পণে যেরূপ প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হয় না, ঝিল্লীদ্বারা যেরূপ গর্ভ আবৃত থাকে, সেরূপ এই বিকারগুলি থাকতে পরমাত্মার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পুরেণানলেন চ।। ৩৯।।

কৌন্তেয়! অগ্নির ন্যায় ভোগে অতৃপ্ত, জ্ঞানীর চিরশত্রু এই কামদ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে। এখন শ্রীকৃষ্ণ কাম এবং ক্রোধ দুটি শত্রুর কথা বললেন। প্রস্তুত শ্লোকে তিনি কেবল একটা শত্রু কামের বিষয়ে বললেন। বস্তুতঃ কামের মধ্যে ক্রোধের অন্তর্ভাব বিদ্যমান। কামনা পূর্ণ হলে ক্রোধ শান্ত হয়, কিন্তু কামনা শেষ হয় না। কামনা পূরণে বাধা উৎপন্ন হলেই পুনরায় ক্রোধ জেগে ওঠে। কামের অন্তরালে ক্রোধ নিহিত থাকে। এই শত্রুর উৎস কোথায়? কোথায় একে খুঁজবে? নিবাসস্থান জানা থাকলে এর সমূল বিনাশে সুবিধা হবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।

এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্।। ৪০।।

ইন্দ্রিয়সমূহ, মন এবং বুদ্ধি এদেরই কামের আশ্রয় বলা হয়। কাম মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারাই জ্ঞানকে আবৃত করে এই জীবকে মোহমুগ্ধ করে।

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।

পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্।। ৪১।।

সেইজন্য অর্জুন! তুমি আগে ইন্দ্রিয়গুলিকে '**নিয়ম্য**'- সংযত কর, কারণ এর অন্তরালে শত্রু বিদ্যমান। তা' তোমার দেহের ভিতরে, বাইরে খুঁজলে কোথাও পাবে না। এটা হৃদয়-দেশের, অন্তর্জগতের যুদ্ধ। ইন্দ্রিয়সমূহকে বশ করে, জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের বিনাশক, এই ক্ষতিকারক কামের নাশ কর। কাম সহজে আয়ত্তে আসে না, অতএব বিকারের নিবাসস্থানকেই অবরুদ্ধ কর, ইন্দ্রিয়সমূহকেই সংযত কর।

কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহ এবং মনকে সংযত করা খুব কঠিন। আমি কি তা করতে পারব? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সামর্থ্য বলে উৎসাহ দিচ্ছেন—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।

মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।। ৪২।।

অর্জুন! এই দেহ থেকে ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সূক্ষ্ম এবং বলবান বলে জানবে। ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে মন শ্রেষ্ঠ এবং বলশালী। মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং

যিনি বুদ্ধির থেকেও অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, তিনিই তোমার আত্মা। সেই হলে তুমি। সেইজন্য ইন্দ্রিয়সমূহ, মন এবং বুদ্ধি নিরুদ্ধ করতে তুমি সক্ষম।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।। ৪৩।।

এইরূপ বুদ্ধি থেকে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সূক্ষ্ম এবং বলবান্ স্বীয় আত্মাকে জেনে, আত্মবল বুঝে, বুদ্ধিদ্বারা নিজ মনকে বশ করে অর্জুন! এই কামরূপ দুর্জয় শত্রুর নাশ কর। নিজের শক্তি বুঝে এই দুর্জয় শত্রুর নাশ কর। কাম দুর্জয় শত্রু। ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে কাম আত্মাকে মোহমুগ্ধ করে, তাই নিজের শক্তি বুঝে, আত্মাকে বলবান্ জেনে কামরূপ শত্রুর বিনাশ কর। এখানে স্বতঃসিদ্ধ হয় যে, এই শত্রু আন্তরিক এবং 'যুদ্ধ'ও অন্তর্জগতেরই।

নিষ্কর্ষ –

বহুধা ব্যাখ্যাকার তাঁরা বর্তমান অধ্যায়ের নাম 'কর্মযোগ' দিয়েছেন; কিন্তু এটা সঙ্গত বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগেশ্বর কর্মের নাম নিয়েছেন। তিনি কর্মের মহত্ব প্রতিপন্ন করে, তার মনে কর্ম-জিজ্ঞাসা জাগ্রত করলেন এবং বর্তমান অধ্যায়ে তিনি কর্মকে পরিভাষিত করলেন যে, যজ্ঞের প্রক্রিয়া কর্ম। এখানে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যজ্ঞ কোন নির্ধারিত দিক্ অর্থাৎ প্রক্রিয়া-বিশেষ। এছাড়া জগতে যা কিছু করা হয় তা' এই লোকেরই বন্ধন। শ্রীকৃষ্ণ যে কর্ম সম্বন্ধে বলবেন, সে কর্ম '**মোক্ষসেহশুভাৎ**'– সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তিদায়ক কর্ম।

শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের উৎপত্তির বিষয়ে বললেন। যজ্ঞ থেকে আমরা কি ফললাভ করি ?–তার বিশেষত্বের চিত্রণ করলেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপর জোর দিলেন। তিনি বললেন-এই যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম। যে অনুষ্ঠান করে না, সে পাপী, আরামপ্রিয় ব্যর্থই জীবন ধারণ করে। পূর্ব মহর্ষিগণও কর্ম করেই পরম নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি লাভ করে ছিলেন। তাঁরা আত্মতৃপ্ত, তাঁদের আর কর্মের প্রয়োজন নেই, কিন্তু তবুও অনুগামীদের পথ-প্রদর্শনের জন্য তাঁরাও উত্তমরূপে কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন। সেই মহাপুরুষগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নিজের তুলনা করলেন, বললেন–আমারও আর কর্ম করবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু অনুগামীদের মঙ্গলের জন্য আমিও সর্বদা কর্মে প্রবৃত্ত। শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট পরিচয় দিলেন যে, তিনিও যোগী।

তিনি কর্মে প্রবৃত্ত সাধকগণকে বিচলিত করতে নিষেধ করলেন, কারণ কর্ম করেই সেই সাধককে পরমস্থিতি লাভ করতে হবে। না করলে নাশ হয়ে যাবে। এই কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানস্থ হয়ে যুদ্ধ করতে বললেন। দুচোখ বন্ধ, ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করে, মন নিশ্চল করে, চিত্ত নিরুদ্ধ করার অভ্যাস, সে কি রকম যুদ্ধ? না, সে সময় কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি সাধকের জন্য বাধক হয়ে দাঁড়ায়, এই বিজাতীয় প্রবৃত্তিসমূহের হাত থেকে উদ্ধার হওয়ার চেষ্টাই যুদ্ধ। আসুরী সম্পদ্ কুরুক্ষেত্র, বিজাতীয় প্রবৃত্তিগুলির এক-একটাকে নাশ করে ধ্যানে মগ্ন হওয়ার চেষ্টাই যুদ্ধ। বস্তুতঃ ধ্যানেই যুদ্ধ নিহিত। বর্তমান অধ্যায়ের সারাংশ এটাই, এতে যজ্ঞের বাস্তবিক স্বরূপ স্পষ্ট হয়নি। কর্মের বিধি-বিধানের সম্যক্ অনুভবও হয়নি। যজ্ঞের স্বরূপ স্পষ্ট হলেই কর্ম কি? তা বোঝা যাবে। এখনও কর্ম স্পষ্ট হয়নি।

বর্তমান অধ্যায়ে কেবল স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের প্রশিক্ষণাত্মক দিকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশ গুরুজনদের জন্য। তাঁরা যদি কর্মানুষ্ঠান নাও করেন, তবুও তাতে তাঁদের কোন লোকসান নেই, করলে কোন লাভও নেই; কিন্তু যাদের অভীষ্ট পরমগতি, তাদের জন্য যদি নিয়ম-নির্দেশ না দেওয়া হয়, তবে তা যে 'কর্মযোগ' একথা বলা যাবেই বা কি করে? যোগেশ্বর বলেছেন- 'যজ্ঞের প্রক্রিয়াই কর্ম'; কিন্তু সেই কর্মের স্বরূপ স্পষ্ট করলেন না এবং যজ্ঞ কি? তা বললেন না। বর্তমান অধ্যায়ে যুদ্ধের যথার্থ চিত্রণ করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ গীতাশাস্ত্রে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগেশ্বর বলেছেন যে, 'এই শরীর নাশবান্, অতএব যুদ্ধ কর।'–গীতাশাস্ত্রে যুদ্ধের বাস্তবিক কারণ এটাই। পরে জ্ঞানযোগের বিষয়ে ক্ষত্রিয়ের জন্য যুদ্ধই কল্যাণের একমাত্র সাধন বলা হয়েছে এবং বললেন যে, এই বুদ্ধি তোমার জন্য জ্ঞানযোগের বিষয়ে বলা হয়েছে। কোন্ বুদ্ধি? এই যে, জয়-পরাজয় উভয়দৃষ্টিতেই জয়লাভ হয়, একথা জেনে যুদ্ধ কর। চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছেন– যোগেস্থিত হয়ে হৃদয়স্থিত এই স্বীয় সংশয় জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা ছেদন করে যুদ্ধার্থ উত্থিত হও। পঞ্চম অধ্যায় থেকে দশম অধ্যায়পর্যন্ত যুদ্ধের কোন চর্চা করেননি। একাদশ অধ্যায়ে কেবল এই বলেছেন যে, এই শত্রুগণ আমার দ্বারা পূর্বেই নিহত হয়েছে, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও। যশলাভ কর। এই মৃতদিগকে তুমি বধ কর। যিনি প্রেরক তিনি করিয়ে নেবেন। মৃতদেরই বধ কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে সংসারকে দৃঢ়মূল অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় বলা হয়েছে, যাকে অসংগতারূপী শস্ত্রদ্বারা ছেদন করে ঐ পরমপদের অনুসন্ধান করবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে যুদ্ধের উল্লেখ নেই। ষষ্ঠাদশ অধ্যায়ে অসুরের চিত্রণ অবশ্যই করা হয়েছে, যারা নরকগামী। শুধু বর্তমান অধ্যায়ে যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা আছে। শ্লোক সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৩ পর্যন্ত যুদ্ধের স্বরূপ, যুদ্ধের অনিবার্যতা, যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হলে বিনাশ, যুদ্ধে হন্য শত্রুদের নাম, তাদের বধ করবার জন্য নিজ শক্তির আহবান এব নিশ্চয়ই তাদের বধ করবার জন্য জোর দিলেন। বর্তমান অধ্যায়ে শত্রু এবং শত্রুর আন্তরিক স্বরূপ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে হয়েছে, যাদের বিনাশ করবার জন্য প্রেরণা প্রদান করা হয়েছে। অতএব–

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে ‘শত্রুবিনাশপ্রেরণা’ নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।। ৩।।

এই প্রকার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে ‘শত্রুবিনাশ প্রেরণা’ নামক তৃতীয় অধ্যায় পূর্ণ হল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াঃ ‘যথার্থগীতা’ ভাষ্যে ‘শত্রুবিনাশপ্রেরণা’ নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।। ৩।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত ‘শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা’র ভাষ্য ‘যথার্থ গীতা’তে ‘শত্রু বিনাশ প্রেরণা’ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।